

তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা

কেয়া রোজারিও

আজ ট্রেনিং রুমে তিল ধারণের জায়গা নেই। অন্য সময়ে ইন সার্টিস ট্রেনিং এর কথা আসলেই কর্মীদের ওই দিনটিতেই নানান কাজ পড়ে যায়। যে যেভাবে পারে এড়ানোর চেষ্টা করে। আজ চির পুরো উলটো। কারণ আজকের প্রজেক্টের একজন ট্র্যাঙ্গেজ্বার ভদ্র মহিলা। বিষয় জেভার এন্ড ডিসক্রিমিনেশন। ঔৎসুক্য ক্রমেই বাঢ়ছে। কেউ এসেছে কিছু শেখার জন্যে, কেউ নেহায়েত তামাশা দেখতে- এবং এদের দলই ভারী। আর কেউ ট্রেনিং রুমের বাইরে জটলা পাকাচ্ছ যেন চরম পাপাক্রান্ত কিছু ঘটতে চলেছে।

নিজেকে জিজেস করলাম “কেয়া রোজারিও তুমি কোন দলে পড়ে? প্রশ্নটা করে স্বত্ত্বাবসিন্দিভাবে নিজেকে খুঁড়তে প্রস্তুত হলাম। নিজেকে খুঁড়ে আমি ব্যাপক আনন্দ পাই। আজকে ভয় হলো আমার না জানা কোন কেয়া বেরিয়ে আসতে পারে। তাই পরক্ষণে সামাল দিলাম এই ভেবে যে, আমার স্টাফ ট্রেনিং-এ আমি না থাকলে কি চলে?”

জনা পঞ্চাশকে মানুষ চরম উত্তেজনায় সময় কাটাচ্ছে। কেননা ভদ্রমহিলা এখনো এসে পৌঁছোননি। তার সহকর্মী আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সবাই ঘড়ি দেখতে ব্যস্ত। যেনে এক্ষণি কোন সার্কাস শুরু হবে। বালমলে কাপড় পড়ে কেউ গলায় চুকিয়ে দেবে চকচকে তলোয়ার অথবা মুখে পুরে দেবে জলন্ত অগ্নি শলাকা।

না তেমন কিছুই ঘটলো না। সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভদ্রমহিলা রুমে ঢুকলেন। এক নজরে মনে হলো একজন সুঠামদেহী পুরুষ গালে আর চিরুকে কিছুটা মাংস সংযোজন করেছেন। অত্যন্ত উত্তেজক কাপড় পরা, ঘাড় বেয়ে নেমে এসেছে ইমপ্ল্যান্ট করা খয়েরি বাদামী চুল। ভদ্রমহিলার চোখে এক গাদা মাশকারা মাখা। না কিছুতেই আমার দেখা কোন মহিলার সাথে এনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। নিজেকে প্রশ্ন করি, “কেয়া, কেনো তোমার এনাকে মহিলা মনে হচ্ছে না? তোমার দেখা কোন মহিলার সাথে মিল পাচ্ছা না বলেই কি?”

ভদ্রমহিলা এসেই একটা খামার পেছনে জড়েসড় হয়ে বসলেন। উনি কি নিজেকে নিয়ে বিব্রত? জানি, এতোগুলো জোড়া জোড়া কৌতুহলী চোখের সামনে যে কেউই বিব্রত বোধ করতে পারে। নাকি ধূঁকের টানটান উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাতে বেরিয়ে এসে করতালি চাইছেন?

ভদ্রমহিলা এবারে উঠে এসে সবার সামনে বসলেন। বললেন “আমার নাম রাজিন্দর”। নাহঃ মোটেও মেয়েলি কোন কর্তৃপক্ষ নয়। তিনি শুরু করলেন তার জীবনের গন্ধ, বললেন তার

শারীরিক গঠন পুরুষের হয়ে জন্মালেও তার মন সর্বদাই নারীদের মত ভেবেছে, আচরণ করেছে। সে কারণেই প্রাইমারি স্কুল থেকেই সহপাঠীরা ঠাট্টা করেছে, অনেক নামে ডেকেছে। আমাদের বোধ হয় ধারণাই নেই কত ছোট বয়স থেকেই এধরগের নানা ঠাট্টা মশকরা করে বাচ্চারা। রাজিন্দর কিছু উপাস্ত দিলেন যে কত বাচ্চা এ ধরনের আচরণের স্থীকার হয়, উপাস্ত দিলেন স্কুল শুটিং এর সাথে এই ঠাট্টা বা বুলিং এর কি সম্পর্ক রয়েছে।

এর মাঝে আমাদের একজন সহকারি বললেন, তাদের পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয় পুরুষ মহিলার শারীরিক উভয় অঙ্গ নিয়ে। বাবা মা সিদ্ধান্ত নেয় নারী অঙ্গের অপসারণের। বাচ্চাটির বয়স এখন দশ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে জানতে চায় কবে সে মেয়েতে রূপান্তরিত হবে? তার শরীরের পরিচয় ভিন্ন হলেও তার মনের পরিচয় ভিন্ন।। বাবা মা যতই শরীরের অঙ্গ অপসারণ করব্বক না কেনো বাচ্চাটি মেয়ে হয়েই জন্মেছিলো। রাজিন্দর এ সময়ে উল্লেখ করেন সিএনএনএ দেখানো ৬০ মিনিটের একটি পরের কথা, যেখানে পুরুষ পরিচয়ে জন্মানো একটি বাচ্চা কথা বলার শুরু থেকেই মাকে জনিয়ে দেয় সে একটি মেয়ে। সে নিজেকে মেয়ে হিসেবেই সন্তান করে। আমার আবারো মিশ্র অনুভূতি হয়, একটা দুবছরের বাচ্চা মাকে বললো সে মেয়ে আর মা-বাবাও তা-ই মেনে নিলো। পরক্ষণে মনে হলো তবে কি আগের ঘটনার মত বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যা পরবর্তীতে বাচ্চার জন্যে ভালো নাও হতে পারে?

রাজিন্দর এবার বলা শুরু করলেন তার পরিবারের কথা। বাবা বিশালদেহী ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, মা বেশ কিছু রেসের সংমিশ্রণ। মা তার এই জীবনকে মেনে নিয়েছেন কিনা বোবা যায় না। কারণ, মা এ নিয়ে কোন কথা বলেন নি। কিন্তু বাবা তাকে ত্যাজ্য করেছিলেন। ওর বাবা ক্যাপ্সার আক্রান্ত হবার পর শেষ তিন মাস ফোনে কথা বলেছে, বাবার নাম আকুতির সাড়া দিতে পারে নি রাজিন্দর। মত্তুশ্যায় বাবা ছেলেকে দেখতে চেয়েছে। রাজিন্দর পরিবর্তিত মুখাবয়ব, পরিবর্তিত দেহ নিয়ে বাবার সামনে যেতে সংকোচ বোধ করেছে। ততদিনে রাজিন্দর মেয়েদের মত গলা খাদে নামিয়ে কথা বলা রঞ্জ করে নিয়েছিলো। কিন্তু বাবার সাথে পুরুষালী কঠেই কথা বলেছে। এতক্ষণ বলে রাজিন্দর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এবারে ওর সেই নিকষ কালো মাশকারা চোখের জলে গলে গাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে। সহকর্মীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই সহকর্মী রূমাল এগিয়ে দিলেন। সবার চোখ অশ্রুসিক্ত। আমারো মন খারাপ হলো এই দুঃখী মানুষটার জন্যে। কিন্তু সাথে সাথে এও মনে হোল তবে কি গাঢ় করে মাশকারা পড়ার কারণ এটাই ? এটাও কি আজকের প্রজেক্টেশনের মহড়া দেওয়া কোন অংশ?

রাজিন্দরকে বার বার হত্যার হৃষিক দেওয়া হয়েছে নির্মম

ক্রোধে, পৈশাচিক উল্লাসে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়েছে, সাবওয়ের নিচে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে, রাজিন্দর মরতে মরতে বেঁচে গেছেন; তবু বেঁচে আছেন।

ওর চাকরি পাওয়ার ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন রাজিন্দর। কর্ম জীবনের শুরুটা খুব কঠৈর, কেউ চাকরি দূরে থাক, ইটারভিউতে ডাকে নি, কারণ ড্রাইভিং লাইসেন্সে তার পুরুষ পরিচয় আর এপ্লিকেশনে নারী পরিচয় খটকা বাঁধিয়েছিলো। এক বন্ধু শেষে পরামর্শ দিলো “এক কাজ কর না কেনো, টেলিফোনে উত্তেজক কথা বলার একটা চাকরি নাও না কেনো? এর পরের ছ’বছর রাজিন্দর বন্ধুর পরামর্শ মত চাকরিই করেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম এমন একটা চাকরি এতো সহজে কেনো ও নিলো? ও পথে পা বাড়লো কেনো? রাজিন্দর বলে চলেছে ক্ষিদের কষ্ট কী তা সে জানে, আজকে যেমন আলাদা ওয়েবসাইট আছে ট্র্যান্সজেন্ডারদের চাকরির জন্যে, আগে এমন ছিলো না। এরা সাধারণত টেলিফোনে কাস্টমার সার্ভিস অথবা রাতে সবার চোখের আড়ালে ব্যাংকে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ডাটা এন্ট্রি চাকরি পেয়ে থাকে। এর পর এমনি একটি ব্যাংকে রাজিন্দরের চাকরি হয়। সমস্যা বাঁধে ও কোন টয়লেট ব্যবহার করবেন তা নিয়ে। পুরুষ অথবা মহিলা সহকর্মী কেউই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না তার উপস্থিতিতে।

পলিটিক্যালি কারেন্টেড সিন্দ্রান্ত নেওয়া হলো রাজিন্দর লিবিতে ফ্যামিলি টয়লেট ব্যবহার করবে। মজার কথা হলো রাজিন্দরের ডিউটি ছাটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত আর লবি বন্ধ হয়ে যায় পাঁচটায়। এক বছর একটানা ও কাজে টয়লেট ব্যবহার করতে পারে নি। ত্রুটায় কাতর হলেও ভুলে গলা ভেজায়নি জলে, পাছে টয়লেটে যেতে হয়। একবছর পর টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান “কল মি হাওয়ার্ড” এ ফোন করে তার সমস্যার কথা জানায়। পরদিনই কর্তৃপক্ষ মহিলাদের টয়লেট ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। হয়তো বা ডিসক্রিমিনেশনের কেস এড়াতেই।

কাজের ওখানে ওকে ইচ্ছে করে স্যার বলে সম্মোধন করেছে কেউ কেউ। রাজিন্দর মেনে নিয়েছেন এই তাছিল্য। আমি এবার নিজেকে প্রশ্ন করি আবার, রাজিন্দর আমার সহকর্মী হলে আমি কি বলতাম? এমন মেয়েলী কাপড় পড়া পুরুষ কে আমি কী বলে সম্মোধন করতাম?

ট্রেনিং এ যে পুরুষরা উপস্থিত ছিলেন সেদিন, দেখলাম তারা মোটেও রাজিন্দরকে নিজেদের একজন ভাবছেন না। যারা অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন তারাও না। মহিলারা তো নয়ই। তাহলে রাজিন্দরের অবস্থান কোথায়? রাজিন্দর ক্রসডেসার নয় যে শুধু মাত্র ঝোঁকের কারণেই মহিলাদের পোষাকের প্রতিই তার আকর্ষণ। সে নিজেকে একজন পুরুষ দেহে বাস করা নারী হিসেবে দেখেন। ভাবলাম তোমার মাঝে বাস করে কোন জনা -তুমি জানো না। এবারে আমি রসুনের

খোসা ছাড়াতে বসলাম। দেখলাম আমার নারী-পুরুষের প্রথাগত সমস্ত ধারণা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমি কি প্রস্তুত? রাজিন্দর এবারে একেবারে ব্যক্তিগত কথা শুরু করলেন। বললেন, মেয়েদের পোষাক পরার সুবিধে হলো পুরুষ বন্ধুর ওদের সাথে লুকিয়ে সম্পর্ক করে না বরং রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যায়। তাই রাজিন্দরও নিজেকে “দ্বিতীয়” ভাবে না বা “মিস্ট্রেস সিন্দ্রে ‘ভোগে না।

আমি মনে মনে বললাম রাজিন্দর তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেনো তুমি কোন মহিলা -আমাদের চোখে তো তুমি নারীর পোষাকে পুরুষই। পরক্ষণে বোঝালাম নিজেকে, এই জন্যেই তো আজকের এই ট্রেনিং। আমার চোখে রাজিন্দর পুরুষ কিন্তু ওর মন? ওর মনতো জন্মাবধি নারী। “biological sex assignment is not gender identity” বাবার বলে চলেছে ও।

একজন সহকর্মী বলে বসলো- রাজিন্দর এতো উত্তেজক কাপড় পড়েছো কেন? চেয়ে দেখো এই রুমের কেউ তো তোমার মত কাপড় পরেনি”। রাজিন্দরের চোখে অপ্রস্তুতি, মুখে রক্তের ছেঁটাছুটি লক্ষ্য করলাম। হাসতে হাসতে হড়হড় করে যে রসিকতা বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, “পুরুষরা এভাবে দেখতে পছন্দ করে তাই পরি”।

এবার আমার অবাক হবার পালা। আবার সেই পুরোন কথা। পুরুষরা যেমন করে দেখতে চাইবে তেমন করেই সাজতে হবে!! তাহলে তুমি আলাদা হলে কীভাবে রাজিন্দর? নিজেকে বোঝালাম -ওর মন তো মেয়েলী মনই, ভাবতেই পারে ও অন্য মেয়েদের মত একই ভাবনা।

ট্রেনিং দু’ঘন্টার জায়গায় তিন ঘন্টায় ঠেকলো। সবার কৌতুহলের পর্ব যেনো কাটতেই চাইছে না। ট্রেনিং শেষ করে যখন বেরিয়ে আসছি খেয়াল করলাম আমি নিজে থেকে রাজিন্দরের সাথে কথা বললাম না। বরং ওর পুরুষ সহকর্মীর সাথে কথা বললাম। আমি ওদের সমস্যা জানতে চাইছি কিন্তু ওকে মেনে নিতে কি আমার কষ্ট হচ্ছে? আমি এর তাত্ত্বিক দিকটায় অগ্রহ দেখাচ্ছি কিন্তু সামাজিক দিকটা এড়িয়ে যাচ্ছি। হয়তো ব্যাপারটার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না বলেই আমার এই পালিয়ে যাওয়া।

ড. ক্যাথেরিনা কেয়া রোজারিও, গবেষক এবং লেখক। বর্তমানে কানাডানিবাসী এবং মুক্তমনা ব্লগে অনিয়মিতভাবে লিখে থাকেন।